যৌন নিপীড়ন বিরোধী আন্দোলনের স্মৃতি ও পর্যালোচনা

নাসরিন সিরাজ এ্যানী ও শামীমা বিনতে রহমানের কথোপকথন

বাংলাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরে ধর্ষণসহ নানাভাবে যৌন নিপীড়নের ঘটনা জারি আছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ছোট ছোট ঘটনা ঘটে প্রতিনিয়তই, কখনো কখনো তা বৃহৎ বিস্ফোরণের আকা নেয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে দিনাজপুরের ইয়াসমিনের ঘটনা প্রথম জনবিস্ফোরণ। এরপরই শিক্ষাঙ্গনের ছোট ও বড়ো প্রতিরোধে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পুরোধা অবস্থানে। রাজনীতি, আন্দোলন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছাত্রী-ছাত্ররা কীভাবে নিজেরাই সক্রিয় কর্মী ও নেতায় পরিণত হয়ে ওঠলো তার অনেক কাহিনী তৈরি হয়েছে এসব আন্দোলনে। বর্তমান কথোপকথনে এরই একটি আখ্যান পাওয়া যাবে। আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় বড় হয়ে ওঠা এই দুজনের আলাপে নিজেদের অভিজ্ঞতা, আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে সহযোদ্ধা ব্যক্তি ও সংগঠনের ভূমিকা, প্রশাসন ও সমাজের বিভিন্ন স্তরে যৌনতা প্রশ্নে নিপীড়নমুখি চিন্তার ধরন উঠে এসেছে। আলাপের স্বতস্ফূর্ত ধরন আছে এখানে, তবে আন্দোলনের বিষয়ে আলোচনা অসম্পূর্ণ, অনেকটাই বাকি। এসব আন্দোলনে সংগঠিত শক্তি হিসেবে বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিলো, তবে এতে দলবহির্ভূত শিক্ষার্থীদের বিশেষত ছাত্রীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ ও সক্রিয় নেতৃত্বই এসব আন্দোলনকে অবিস্মরণীয় মাত্রা দান করেছে। এসব অভিজ্ঞতা নিয়ে আমরা আরও লেখা, মত, বিতর্ক প্রকাশ করতে চাই।

নাসরিন: জাহাঙ্গীরনগরের ধর্ষণ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মেয়েদের সাথে কথোপকথন করতে আমরা অনেক বছর ধরেই আগ্রহী। কি তাদের অনুপ্রাণিত করেছে এ আন্দোলনে যোগ দিতে এবং এই আন্দোলনই বা কিভাবে তাদের পরবর্তী জীবনদর্শনকে অনুপ্রাণিত করেছে সেই সব নিয়ে মূলত আলাপ করতে চাই। ১৯৯৮ এর আগে এমনকি পরেও, যৌন নিপীড়ন বিরোধী আন্দোলন সংগঠনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষিকা-শিক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। সেই আন্দোলনগুলো নিয়েও আমরা তাদের কাছে মূল্যায়ন শুনতে চাই। ধারাবাহিকভাবে সেটা আমরা করবো, তবে তোমার কাছেই প্রথমে আসছি। আমি শুরু করছি কল্পনাকে[১] নিয়ে আমার প্রথম আন্দোলন অভিজ্ঞতা নিয়ে। এই আন্দোলনটি আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে, অনেক বন্ধু উপহার দিয়েছে যেটা ১৯৯৮ এর ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনে আমার অংশগ্রহণকে প্রভাবিত করেছিল। তাই সেটা দিয়েই শুরু করছি। তুমি কি তোমার গল্পটা বলবে আমাকে?

শামীমা: তোমারে অনেকদিন রেসপন্স না কৈরা আজকে লিখবোই ঠিক কৈরা ওয়ার্ড ফাইল ওপেন হৈতে হৈতে ইউটিউবে গান প্লে করসি একটা। রেডিওহেডের একটা গান "ক্রিপ", "সো ফাকিং স্পেশাল/ আই উইশ আই ওয়াজ স্পেশাল/ বাট আই অ্যাম এ ক্রিপ আই অ্যাম এ রিডো/ হোয়াট দ্য হেল অ্যাম আই ডুয়িং হিয়ার/ আই ডোন্ট বিলং হিয়ার . . ."।

আমাদের ব্যাচমেইট কল্পনাকে উত্যক্ত ও শারীরিক পীড়নের মধ্য দিয়া আমার ডিপার্টমেন্টের মানে আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টের এক ব্যাচ সিনিয়র ভাইয়া সীমান্ত যে যৌন সন্ত্রাস চালাইসিল, সেইটার সাথে আমার সম্পর্ক এতটাই ঘনিষ্ঠ যে, আমি কোন কিছুর সাথে প্রবলভাবে যুক্ত হয়ে আবার একটা প্রিয়দের কাছ থেকে ছিটকে পড়ার অভিজ্ঞতার মধ্যে গেসি জীবনে প্রথমবার।

এই আন্দোলনটা আমার মধ্যবিত্ত বাংলাদেশি বাঙালি মুসলমান পরিবারের রেস্ট্রিকশনের মধ্য দিয়া বড় হওয়ার প্রক্রিয়াক্রান্ত জীবনে প্রথমবারের মতো মিছিলের আয়োজন করা বা এই আন্দোলনটার পুরা পরিকল্পনার মধ্য যুক্ত হওয়া-সব কিছুই প্রথম। সাদা-কালো অক্ষরে পড়া, ফটোগ্রাফে দেখা মিছিল-শ্লোগান চামড়ার ভিত্রে জীবনে প্রথম ফুঁটে ওঠা। স্বতস্ফূর্ততার মধ্যে আমদানীকৃত সচেতনতার ইনজেক্ট করার প্রক্রিয়ার সাথে প্রথম পরিচয় ঘটা। সেটাও বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকেই আবেগায়িত, ঢুলু ঢুলু স্বপ্নে যোগ দেয়া প্রিয় ছাত্রফ্রন্টের সাথে অস্বস্তিপূর্ণ পরিচয় হওয়া। তখন অস্বস্তিই ছিল, সময়ে পরবর্তী ইন্টারপ্রিটিশনে অস্বস্তিটা কর্তৃত্ব, পুরুষালি কর্তৃত্ব হিসাবে পরিষ্কার হৈসিল।

সেইটা ১৯৯৫ সাল। আমরা প্রথম বর্ষ ফাইনাল দিয়া ফিল্ডওয়ার্ক করতেসিলাম এবং সেটা ছিল এপ্রিল মাস। আমরা ইউনিভার্সিটিতে ঢুকসিলামই বছর দেড়েকের সেশন জ্যাম নিয়া, তারপর সেটা আরো দীর্ঘায়িত হয়। সেই সময় তোমাদের ব্যাচটাও ক্লাস শুরু করসে, আমরা সবাই থাকি শহীদ জননী জাহানারা ইমাম হলে। আমরা প্রথম ব্যাচ আর তোমরা আমাদের কয়েক মাস গ্যাপে দ্বিতীয় ব্যাচ হিসাবে ক্লাস শুরু করলা। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব সেশন জ্যামের সাথে ছিল ডিপার্টমেন্টগুলার আলাদা জ্যাম। তাই একেক ডিপার্টমেন্ট পরীক্ষা শুরু করসিল একেক সময়। আর শেষও করতেসিল আলাদা আলাদা সময়ে।

এপ্রিল মাসের ১ তারিখে আমাদের ফিল্ড ওয়ার্ক শুরু হয়। স্থান ছিল সাভারের পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন-রাজা হরিশচন্দ্রের বাড়ি, রাজাশন, ফোর্ট ইত্যাদি দেখে বেড়ানো, পাল-সেন যুগের নিদর্শনের সাথে পরিচিত হওয়ার কোর্সটি ফিল্ডওয়ার্কে আর্কিওলজিক্যাল সাইট এক্সপ্লোরেশন। টাইট শিডিউল। সকাল ছয়টা মানে সকাল ছয়টা।

আমরা সাভার বাজারে পৌঁছেই যখন সকালের নাস্তা করতে ঢুকলাম, তখন আমাদের ডিপার্টমেন্টের এক শিক্ষক, আমাকে বাদ দিয়া আমার অন্যান্য ক্লাসমেইট মেয়ে বন্ধুদের আলাদা করে কী যেন বলতেসিল দেখলাম। আমি পাশের টেবিল থেকে শুনে বুঝলাম, তিনি মতামত চাচ্ছেন এবং সেই মতামত আমার কাছে চাচ্ছেন না। ইতিমধ্যে আমি হোস্টেলে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে না ঢুকে রাত সাড়ে ৯টা/১০ টায় ঢুকে, প্রায়ই হাউজ টিউটরের সাথে উচ্চ বাক বিতণ্ডা করে, যে-*"ছেলেদের চেয়ে বেশি স্কোর করে আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেয়েছি পড়াশুনার, আমরা বাইরে থাকতে পারবো না আর ওরা সারা রাত বাইরে থাকবে-এইটা আমি মানি না"* এইসব কথা আমার ডিপার্টমেন্টেও গেছে, আমি জানি। ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান স্যার আমাকে ডেকে বলসিলেন একদিন যে হোস্টেল প্রভোস্ট বলসে আমি অ্যরোগ্যান্ট। আমার বিহেইভিয়ার খুব রুড। তো এইসব মনে আসায় আমি নিজেই স্যারের টেবিলটাতে গিয়ে বসলাম এবং তিনি একটু থামলেন এবং আবার বলতে থাকলেন, *"খেয়াল করবে, সীমান্ত তোমাদের ডিপার্টমেন্টের। তোমাদের সিনিয়র ভাইয়া। আমি যতদূর জানি মেয়েটা প্রভোস্টের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছে, তাতে বিষয়টা অনেকদূর*

১. নিপীড়িত নারীর নাম প্রকাশ নিয়ে আমরা সব সময় সতর্ক এ কারণে যেন মেয়েটি সামাজিকভাবে বাড়তি হেনস্থার শিকার না হয়। কিন্তু এ লেখায় আমরা কল্পনার নাম প্রকাশ করছি কারণ আমরা কল্পনাকে আমাদের সাহসী আর লড়াকু আরেক সহযোদ্ধাই মনে করি যে আমাদের সাথে তার অভিজ্ঞতার কথা ভাগাভাগি না করলে আমাদের নিজেদেরই যৌন নিপীড়ন বিরোধী লড়াই সংগ্রামের রাস্তা চেনা হতো না। কল্পনার লড়াকু মনোভাবের স্বীকৃতি দিতেই ওকে আমরা নামহীন না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

গড়াবে। তোমাদের উচিৎ তোমাদের সিনিয়র ভাইয়াকে সাপোর্ট করা"।

আমি পুরা 'থ' হয়ে শুনলাম, এই কী বলে! এই শিক্ষক ক্লাসে ইন্টারেক্টিভ, আমি তার ক্লাসে প্রশ্ন টশ্ন করি, এবং উনাকে আমার ক্লাসরুমে খুব কেয়ারিং আর কম্যুনিকেটিভ মনে হয়। ইনি কী বলেন এইসব!! একটু বুঝে কথা শেষ হওয়ার পর- আমার পাশে আমার ক্লাসমেইট শৈলি, সাগর, অনামিকা, শর্মী সবাই, ওরা এর আগে কী কী বলসে, আমি জানি না, কিন্তু ওদের যে কোন একজন বলে উঠার আগেই- আমি বল্লাম "*অসম্ভব। আমি তো কোনভাবেই সীমান্তকে সাপোর্ট করবো না। ওকে কেন সাপোর্ট করবো? আপনার কথা অনুযায়ি ও কল্পনাকে অ্যাসল্ট করসে, ওকে সাপোর্ট করার প্রশ্নই আসে না*"।

তুমি জান কী ঘটনা ঘটছে?

না আমি পুরা জানি না।

ও ওর লিখিত অভিযোগে বলেছে, সীমান্ত তাকে ট্রান্সপোর্টে রিকশা থামিয়ে রিকসা থেকে নামিয়ে চড় মারে। কিন্তু এখানে ঘটনা হলো, ওদের মধ্যে অ্যাফেয়ার রিলেশন আছে। এবং এইটা তার অংশ। এটা ব্যক্তিগত বিষয়।

রিকশা থামায়া চড় মারছে সীমান্ত! আর আপনি আমাকে বলতেসেন সীমান্তকে সাপোর্ট করতে?

সীমান্ত তোমার ডিপার্টমেন্টের।

কল্পনা আমার হলের। কল্পনা মেয়ে। আমি মেয়ে। প্রশ্নই উঠে না সীমান্তকে সাপোর্ট করার।

তুমি কি চাও তাইলে ছেলেরা মেয়েরা চৌরঙ্গীতে মারামারি করুক?

আমি ক্যান সেটা চাইবো? সীমান্তকে সমর্থন না করার সাথে ছেলে আর মেয়ের মারামারির কী সম্পর্ক?

সীমান্তকেই সাপোর্ট করতে হবে তোমাদের, ব্যাস।

আমি তখনো কল্পনাকে চিনিই না। কল্পনা নামক একটা মেয়ে আমার ব্যাচমেট, ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টে পড়ে, আমি ঘটনা কিছুই জানি না। তার কিছু মাস আগেই আমি জীবনের প্রথম প্রেমে আবদ্ধ হয়ে দুনিয়াদারী ভুলে প্রেমিকের সাথেই ডুবে থাকতাম, ঘটনা প্রবাহে কোন সম্পর্ক আমার নাই। আমি খুব অবাক হলাম। এবং আমার এক শিক্ষকের আচরণ, কথা বলা এবং ছাত্রদলের একটা ছেলেকে তার বাঁচানোর চেষ্টা, আমাকে খুব অস্থির করে ফেলল। কে এই কল্পনা? তাকে আমার চিনতে হবে।

৩ দিনের ট্যুর শেষে আমি হলে ফিরে এসে প্রেমিক বাদ দিয়ে কল্পনার খোঁজ করলাম ওর ব্যাচেরই শান্তার কাছে। শান্তা আমাকে রুম নম্বর বল্লো। চারতলায় আমার ব্লকের। আমি তার রুমে গেলাম। পরিচিত হৈলাম এবং বল্লাম চলো আমরা দোতলার লনে গিয়া বসি। তখন সন্ধ্যা। আমরা দোতলার লনে গিয়া বসলাম। এবং আমি ট্যুরে স্যারের কাছ থেকে যেইভাবে জানসিলাম ঘটনা তাই ওকে জানালাম। ও আমাকে বলতে থাকলো-কীভাবে সীমান্ত তাকে প্রেম করার জন্য জোর করতে থাকে দিনের পর দিন। হলের গেইটে, ডিপার্টমেন্টে, ক্যাফেটেরিয়ায়, রাস্তায় এবং সবশেষ তাকে কিডন্যাপ করে ঢাকায় নিয়া যায় এবং বিয়ের জন্য কাজী টাজী ডেকে সীমান্ত জোরাজুরি চরম করে, তখন সে সেখান থেকে পালায়া তার বোনের বাসায় যায়, ঢাকায় ইব্রাহিমপুর অথবা শাহীনবাগ এরকম কোন জায়গায় আমি ভুলে গেছি। এরপর সে ক্যাম্পাসে এসে ফার্স্ট ইয়ারের ভাইবা দেয়ার জন্য ডিপার্টমেন্টে যেতে ট্রান্সপোর্টের ওখানটায় (তখন জাহানারা ইমাম হল থেকে স্যোসাল সায়েন্স ফ্যাকাল্টি যাইতে ট্রান্সপোর্ট হৈয়া যাইতে হৈত। এখনকার মতো প্রীতিলতা হলের সামনে দিয়া সোজা যাওয়ার রাস্তাটা ছিল না) সীমান্ত রিকসা থামায়ে তাকে হাত ধরে জোরে টান দিয়ে নামায় এবং চড় মারে। গালাগালিও করে।

সব শুনে আমার পুরা গা হাত পা শক্ত হয়ে আসলো। আমি ওকে জিজ্ঞাস করলাম, তুমি কি করবা এখন? তোমার আর কি প্ল্যান?

কল্পনা পুরা ঘটনা বলার সময় অনেকবার কান্না আটকায়া রাখতে পারে নাই। আমরা দোতলার লনে সন্ধ্যার মতোই ভারী হয়ে বসে থাকলাম কিছুক্ষণ, পুরা ঘটনা শোনার পর। প্রশ্ন শুনে সে বল্লো, আমি জানি না আর কী করবো, তবে ওর শাস্তি চাই।

কল্পনা ছিল একটা খুবই ছিমছাম, শান্ত, কোমল দেখতে মেয়ে। কিন্তু ওর কান্না মুছে আবার কথায় ফেরত আসার ভঙ্গী ছিল খুবই দৃঢ়।

আমি হঠাৎ করেই বল্লাম, চলো আমরা টিভি রুমে আজকে সব মেয়েদের ডেকে কথা বলি। ওরা কী বলে শুনি, ক্যামন হয়?

কল্পনা বল্লো, হ্যা কথা বলি। আমি সবাইকে ঘটনাটা জানাইতেও চাই। অনেকেই জানেনা ঠিকঠাক। বলতেসে আমার সাথে নাকি ওর প্রেম ছিল। "*ওর সাথে প্রেম করবো আমি? ওইরকম বিশ্রি দেখতে একটা ছেলে। ছাত্রদল করে বলে যা চাইবে, তাই পাবে?*"

আমরা লন থেকে ফেরত এসে, আমি চলে গেলাম দোতলায় স্ট্যাটিসটিকসের লিজি আর ইভার রুমে। ওইখানে গিয়ে ওদের সাথে কথা বল্লাম। ওরা সবাই জানে অলরেডি ঘটনা। আমরা একমত হলাম কমন মিটিংয়ের। ওখানে ছাত্র ইউনিয়ন করা শিল্পী আছে। সেও একমত। সে বেশ অর্গানাইজার টাইপের। এরপর শান্তার সাথে কথা বার্তা। ক্যান্টিনে খেতে বসে আমরা সবাই সবার মতো যার সাথে দেখা হচ্ছে, তাকেই টিভিরুমের মিটিংয়ের কথা বল্লাম।

আমার সকল ধরনের ভাবনা চিন্তাকে টপকে মেয়েরা বল্লো, আমরা মিছিল করবো। কয়েকটা গলা একসাথে বলসিল এইটা। 'এখন অনেক রাত', তখন রাত ১১টা বাজে- এইটাকে ভাবনার তালিকায় যুক্ত রেখেই তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত হৈল আমরা মিছিল করবো পুরা হলের ভিত্রে।

আমার তখনকার নোটবুকের তথ্যে তারিখ পুরাপুরি ঠিকঠাক নাই, মানে একটু এদিক ওদিক আছে। সেইটা সম্ভবত ৩ এপ্রিল। রাত দশটার দিকে প্রথমে খালা (ছাত্রী হলের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী), তারপর ইভা, শিল্পী ঘন্টা বাজায়ে মেয়েদের টিভিরুমে মিটিং এ আসার আহ্বান জানায়। তোমাকে আমার মনে পড়ে, ক্যান্টিনে তুমি আসার পর, কেউ একজন তোমাকে বলতেসিল ঘটনাটা এবং টিভি রুমের মিটিংয়ের কথা।

মেয়েরা সাড়ে দশটার মধ্যেই চলে আসলো বেশিরভাগই। দুইটা ব্যাচের মেয়েরা- ২২তম এবং ২৩ তম ব্যাচ। টিভি রুমে। প্রথমে শান্তা যে কল্পনার ব্যাচ মেইট, ক্লাস মেইট, যে ঘটনাটা বেশি ঘনিষ্ঠভাবে জানতো এবং প্রভোস্টের কাছে লিখিত অভিযোগ দেয়ার উদ্যোগে ছিল, সে বর্ননা করলো তারমতো করে। এরপর কল্পনা দাঁড়ালো সবার সামনে। সে শত চেষ্টা করে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করেও কান্না আটকাতে না পেরে- অথবা ওই কান্নাই তখন ওর স্বাভাবিকতা- সে বলতে থাকলো, তার ওপর সীমান্তের শারীরিক এবং মানসিক, যৌন সন্ত্রাসের ঘটনা। কল্পনা শেষ করলো "*আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চাই। সীমান্তের শাস্তি চাই*"।

এরপর আমি দাঁড়াইলাম সবার সামনে। আমি বল্লাম "*তাইলে আমরা এখন কী করবো?*"

আমার সকল ধরনের ভাবনা চিন্তাকে টপকে মেয়েরা বল্লো, আমরা মিছিল করবো। কয়েকটা গলা একসাথে বলসিল এইটা। 'এখন অনেক রাত', তখন রাত ১১টা বাজে- এইটাকে ভাবনার তালিকায় যুক্ত রেখেই তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত হৈল আমরা মিছিল করবো পুরা হলের ভিত্রে। এবং টিভিরুম থেকেই মিছিল শুরু হলো। সেই রাতটা ছিল অদ্ভুত! আমরা কেউই মিছিলে শ্লোগান লিড দেই নাই এর আগে। আর আমি যে কয়টা

মিছিল করসি ছাত্র ফ্রন্টে, যে লিড করতো সেই লিড থেকেই পরের লাইনগুলা একবার শুনেই মনে রাখা যায় যেমন: এই সমাজ নোংরা সমাজ, তারপর মিছিলকারীরা শ্লোগানে বল্লো, "*এই সমাজ ভাংতে হবে*"। এই টাইপ। কিন্তু এইটা তো আস্ত নতুন ঘটনা! শ্লোগান ক্যামনে দেয়? ইনস্ট্যান্ট শ্লোগান বানালাম, ইভা লিজির সাথে কথা বলে। তারপর শ্লোগান দিতে থাকলাম "*আমার বোন অপমানিত ক্যান/ প্রশাসন জবাব চাই*", "*আমার বোনের অপমান/সহ্য করা হবে না*", "*নির্যাতনকারী সীমান্তের/ বহিস্কার করতে হবে*"-এইরকম।

নতুন বানানো শ্লোগান বলে প্রথম দিকে মিলছিল না। লিজি, ইভা, শান্তা, শিল্পি এরা আলাপের কারণে পরের অংশটুকু জানতো, ওরা প্রথমদিকে গলা উঁচু করে লিডের সাথের লিডটা উচ্চারণ করতো-এইভাবে রিদম মিলতে থাকলো। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, মেয়েরা রুম থেকে বের হয়ে এসে এসে মিছিলে যোগ দিতে থাকলো। তিন তলার টিভি রুম থেকে বের হয়ে চারতলা পুরা ব্লক ঘুরতে ঘুরতে মিছিলে প্রায় শ খানেক বা তারও বেশি হতে পারে, মেয়েরা শ্লোগান দিতে থাকলো। আমার মনে আছে একবার শ্লোগান দিতে দিতে সামনে থেকে পিছনে চলে আসছিলাম যখন, তখন তোমাকে দেখসিলাম। আমরা তখন তেমন কথা বলতাম না কিন্তু মিছিলে ছিলাম। এইরকম অসংখ্য বন্ধুরা। আমার মনে হয় আমাদের সবারই ওইটা প্রথম মিছিল বা আন্দোলনে যুক্ত হবার অভিজ্ঞতা।

মিছিল দোতলায় পুরা ব্লক ঘুরে আসার পর যখন নিউজ রিডিং রুম আর লনে (যেখান থেকে নবাব ফয়জুন্নেছা হলের রাস্তা, প্রান্তিকের দিকে যাওয়ার রাস্তা, শিক্ষকদের কোয়ার্টার দেখা যায়, ছাদ বিহীন খোলা জায়গা আসলে) তখন আমাদের শ্লোগানের মধ্যেই খেয়াল করি স্ট্রীট লাইটগুলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, একে একে। এতে কারো মধ্যেই আতঙ্ক তৈরি হয় নাই। বেশিরভাগই বল্লো, মিছিল বাইরে যাবে, আমরা অন্যান্য হলের সিনিয়র আপুদের বলবো আমাদের দাবির কথা। আমরা সবাই মিলে সীমান্তের শাস্তি দাবি করবো ভিসির কাছে।

সিদ্ধান্তগুলা এত প্রম্পটলি হৈতেসিল! সবাই নিচে চলে আসলো। ডাইনিং থেকে একজন গিয়া শিল-পাটার শিল নিয়া আসলো, তালা ভাঙ্গা হবে। এটাতে নেতৃত্ব ছিল শান্তার। মেয়েরা গেইটে শ্লোগান দিচ্ছিল। অ্যাসিসট্যান্ট সুপার রুম থেকে বের হয়ে আসলো। তার রুম পাশেই। সে কী কী বল্লো, কেউ কানেই তুল্লো না। কিছুক্ষণ পর অ্যাসিস্টেন্ট সুপার বল্লো "*প্রভোস্ট স্যার ফোন করসে, শামীমার সাথে কথা বলবে*"। আমি গেলাম। প্রভোস্ট আমাকে বল্লো "*শামীমা যেভাবেই হোক মিছিলটা ঠেকাও। হোস্টেলের কিছু নিয়ম কানুন আছে। আমি আসতেছি*"। আমি বল্লাম, "*স্যার আমি ঠেকানোর কে? সবাই মিলেই তো সিদ্ধান্ত নিয়ে মিছিল করসে*"।

"*সিকিয়্যুরিটি ইস্যু আছে . . .*" উনি আরো কী কী জানি বলতেসিলেন, আমি ল্যাণ্ডফোনের রিসিভারটা ধরে রাখলাম শ্লোগানের শব্দে। আর জোরে জোরে শ্লোগান হচ্ছিল "*আমার বোনের অপমান/সহ্য করা হবে না*", "*নির্যাতনকারী সীমান্তের/বহিস্কার করতে হবে*"

প্রভোস্ট ফোন রেখে দিলেন এবং শ্লোগান চলতে থাকলো একদম কলাপসিবল গেইটের মুখে। এবং মজার ব্যাপার ছিল, প্রভোস্ট যেই সময় এসে কলাপসিবল গেইটের কাছে দাঁড়ায়, তখনই শান্তার শিলের শেষ বাড়িতে তালা ভেঙ্গে খুলে পড়ে। কেউই যেন প্রভোস্টকে দেখে নাই। তাকে এক পাশে ফেলে কলাপসিবল দরজা দুইভাগ দুইদিকে সরায়ে সবাই বের হয়ে পড়লো। গেইটের মামা (ছাত্রী হলের দারোয়ান) আমাদের একবার বল্লেন, ছাত্রদলের ছেলেরা আল বেরুনী হলের দিক থেকে আসছে আমাদের ওপর হামলা চালানোর জন্য।

আমরা বের হয়া পড়লাম।

মিছিল করে নওয়াব ফয়জুন্নেছা হলের সামনে এসে বন্ধ গেইট মামা খুলবেনা বলার পর লুবনা আমি সহ আরো কয়েকজন দেয়াল টপকে ভিত্রে যাই এবং দেখি গেইটের সামনে আপুরা দাঁড়ায় আছে। তাদের কাউকেই চিনি না, কোন দল করে, তাও জানি না। এসব মাথায়ই আসে নাই তখন। আমাদের মিছিলের শব্দে তারা এসে দাঁড়াইসে, এতেই খুশী হয়ে বল্লাম "*আপু আমাদের ব্যাচমেইট কল্পনাকে ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক সীমান্ত অ্যাসাল্ট করসে। আমরা সীমান্তের শাস্তি চাই। একটা মিছিল করতেসি, আমাদের সাথে জয়েন করেন প্লিজ*"।

একটা আপু বল্লো "*বেয়াদব মেয়ে কোথাকার! ফার্স্ট ইয়ারে এসেই পলিটিক্স করতে আসছ। তোমরা কি জান যে সীমান্তের সাথে কল্পনার প্রেম ছিল। ও এখন ওই সম্পর্ক স্বীকার করতে চায় না। যা হৈসে তা তাদের সম্পর্কের বিষয়। যাও বের হয়ে যাও এখান থেকে*"।

ধমক খেয়ে আমরা ওইখান থেকে চলে আসলাম। আবার দেয়াল টপকায়ে বাইরে এসে দেখি ফজিলাতুন্নেছা হলের আপুদের একটা গ্রুপ চলে আসছে সেবা আপার নেতৃত্বে। সেবা আপা ছাত্র ফ্রন্টের তখনকার বিখ্যাত ছাত্রী নেতা। জেসমিন আপা, শান্তা আপা, ছাত্র ইউনিয়নের রুমী আপা এরকম আরো আপারা আসছে। উনারা আমাদের সাথে হলে আসলেন। আমরা তাদেরকে আমাদের তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা বল্লাম। কর্মসূচির মতো। আমরা বল্লাম, আমরা একটা মিছিল করবো কালকে, রেজিস্ট্রার বিল্ডিং হয়ে ক্যাফেটেরিয়ায় শেষ হবে।

অনেক লম্বা সময় ধরে কথা বলতেসি। অনেক বিষয় আছে এই আন্দোলনে। ছাত্র ইউনিয়নের তখনকার ছাত্রী নেতা সিঁথি আপা আমাকে বলসিলেন যে, জাহাঙ্গীরনগরের ইতিহাসেই নাই এমন গভীর রাতে প্রতিবাদ করে মেয়েরা মিছিল নিয়ে বের হয়ে আসছে হল থেকে। সিঁথি আপা তার অভিজ্ঞতার তথ্য থেকে আরো বল্লেন, এই আন্দোলনে মেয়েদের অংশগ্রহণ এতো ব্যাপক ছিল যে, যেইটা এর আগে কখনো দেখা যায় নাই। তিনি বলেন, এর আগে ১৯৯২ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে এক ছাত্রীর "গায়ে হাত দেয়ার" ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে যৌন নিপীড়ন বিরোধী আন্দোলন হয়েছিল, এই আন্দোলনে তার চেয়ে বেশি মেয়েদের অংশগ্রহণ ছিল। এরই পরবর্তী প্রবল এবং অবভিয়াস ঘটনা হলো ধর্ষণ বিরোধী আন্দোলনে ব্যাপক আকারে এবং সিগনিফিকেন্টলি পুরুষের তুলনায় সংখ্যায় বেশী, রাজনৈতিক দলবিহীন কিন্তু রাজনীতি সচেতন ছাত্রীদের অংশগ্রহণ। সেই আলাপেই আসতেসি, কিন্তু তার আগে একটা ব্যাপার বলি, যেইটা আন্দোলন চলাকালীন সময়ে খেয়াল করি নাই, পরে মাথায় আসছে। ছাত্রদলের নেতা সীমান্ত যে কল্পনাকে উত্যক্ত, ব্ল্যাকমেইল, নিপীড়নের ঘটনাটা ছাত্র সংগঠনগুলা জানতো। কিন্তু তারা কেন আন্দোলন শুরু করে নাই? ধর্ষন বিরোধী আন্দোলনেও এদের কাউকেই সাংগঠনিকভাবে আন্দোলন শুরু করতে দেখার অভিজ্ঞতা আমার হয় নাই। কিন্তু আবার প্রীতিলতার নামে হল করার আন্দোলন, বর্ধিত ফি বিরোধী আন্দোলন, শিবির বিরোধী আন্দোলন-এসবে তারা বেশ উদ্যোগি এবং উদ্যমি দেখসি। কিন্তু নারী ইস্যুর বেলায় এরা পুরুষরা বা এদের ভারী পদ ধারণ করা মেয়েরা আন্দোলন শুরু করতে পারে নাই। মানে ইস্যুটা বুঝতেই পারে নাই। মানে, তোমার কি মনে হয়, বুঝতে না পারার কারণ কি? এদের সিস্টেম কি নারীদের ইস্যু বুঝতে দেয় না, নাকি পুরুষ এর সোস্যাল কনস্ট্রাকশন যে কর্তৃত্ব করার পুরুষালি ইজ্জত তাদের দিসে, সেইখান থেকে তারা বাইরাইতে পারে না?

নাসরিন: তোমার কথাতে অনেক কিছুই মনে পড়লো। আমি রাজনৈতিক সংগঠন করতাম না, আমার দুই রুমমেটও না, এমনকি কাছের বন্ধুরাও

না। তারপরও আমরা সবাই জেনে যাই সীমান্ত নামে ছাত্রদলের একটা ক্যাডার কল্পনাকে "উঠিয়ে" নিয়ে গেছে, জোর করে বিয়ের শাড়ী পরিয়ে কাজী ডেকে বিয়ে পড়িয়েছে এবং নিজের বন্ধুদের মধ্যে বিয়ের ছবিও দেখিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার আগেও এমন ঘটনা প্রায়ই খবরের কাগজে পড়তাম, রাগ হতাম, পুলিশ অপরাধী ধরতে পারছেনা বলে হতাশ হতাম, মেয়েটির প্রতি জাস্টিস হচ্ছেনা এই ক্ষোভে ডায়েরীতে এটা ওটা লিখে রাখতাম কিন্তু সত্যি সত্যি মিছিলে নেমে কোনদিন প্রশাসনের কাছে দাবী করিনি নিপীড়কের বিচার চাই, করতে হবে।

তোমাদের বক্তৃতায় একজন ছাত্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্ব এসব কথা শুনতে শুনতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়টা যেন পুরো দেশের একটা ছোট্ট মডেল হয়ে ধরা দেয় আমার কাছে। আমরা শিক্ষার্থীরা যেন নাগরিক আর ভাইস চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি। আমাদের জেনারেশনটা স্কুল কলেজ পার করেছি এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের খবরা খবর পড়ে, নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী অনেকে সেই আন্দোলনে সক্রিয়ও ছিল। গণতন্ত্র সুশাসন-মানবাধিকার-নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করতে জনগণের জোরই যে বড় জোর সেই উপলব্ধিটা আমাদের কাছে তখন খুব টাটকা। তাই সম্ভবত আমাদের কাছে বড় পরিসর থেকে ছোট পরিসরে আন্দোলন কল্পনা করা খুব কঠিন কাজ ছিলনা। কল্পনার প্রতি জাস্টিস করতে হলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের (নাগরিকদের) দলবদ্ধ হয়ে ভিসির (রাষ্ট্রপতির) ওপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে যেন তিনি এই অন্যায়টা ইগনোর না করেন এরকম ভাবনা-চিন্তা ছিল আমার। বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়টাই বা ছাত্রী-ছাত্র। তাছাড়া সবাই সবাইকে চেনে। ভিসি একটু গুরুত্ব দিলেই ছেলেটাকে শাস্তি দেয়া যায়- এসব ভেবেছিলাম আমি। আন্দোলনে আমাকে রিক্রুট করতে তাই তোমাদের তেমন বেগ পেতে হয়নি। *"সকালে কিন্তু মিছিলে চলে আসিস"*- বড় আপুদের শুধু এতোটুকুই বলতে হয়েছে। একটা মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুলে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করা! এই অন্যায়ে চুপ করে থাকার প্রশ্নই আসে না। আর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে তো নয়ই, যেখানে আমরা সবাই শিক্ষিত, ন্যায় অন্যায় বোধকে ম্যানিপ্যুলেট করার মত যথেষ্ট স্বার্থান্বেষী তখনও আমরা হয়ে উঠিনি।

কিন্তু আসলে আমার ধারণা ভুল ছিল। ক্ষমতার প্রতি আসক্তিই কল্পনাকে নিয়ে আন্দোলন সফল করতে দেয়নি। আন্দোলনটা কিভাবে ব্যর্থ হল সে নিয়ে আমার কিছু স্মৃতি আছে। সেগুলো আমি তাৎক্ষণিকভাবে লিখে রাখিনি কিন্তু সেই স্মৃতিগুলো এমনভাবে আমার মাথার কোষে কোষে স্থান করে নিয়েছে যে পরবর্তীতে জাহাঙ্গীরনগরের আন্দোলনগুলোতে কিভাবে আমি সম্পৃক্ত হবো সেই সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হয়েছে সেই স্মৃতির প্রভাবে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডি ছাড়িয়ে পরবর্তিতে জাতীয় পর্যায়ের নাগরিকদের আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়াগুলোও।

দিন তারিখ আমার মনে নেই, কিন্তু সময়টা সকাল ছিল। আন্দোলনের নেত্রী আপারা জানিয়ে দিয়েছিল আজকে মিছিলের আগে আমরা জাহানারা ইমাম হলের প্রভোস্টের অফিসের সামনে জড়ো হবো। যথা সময় যথাস্থানে গিয়ে দেখি বারান্দায় বাম সংগঠনের ছাত্র নেতারা দাঁড়িয়ে আছে। ছাত্রীদের হলের গেইট পেরুনো ছাত্রদের মানা তাই একটু অবাক হলাম আজকে তারা আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতে একেবারে প্রভোস্টের অফিসের সামনে চলে এসেছে। সাধারণত তারা বক্তৃতা দেয় ভিসির অফিসের সামনে যখন আমরা মিছিল শেষ করে সেখানে জড়ো হই। সারোয়ার ভাই নামে ছাত্র ইউনিয়নের এক নেতা বক্তৃতা দিলেন (অন্যরাও বোধহয় দিয়েছিলেন সেগুলো হয়তো প্রাসঙ্গিক নয় বলে এখন আর মনে নেই)। তিনি আমাদের জানালেন আমাদের নাকি এখন কৌশলী হতে হবে। তিনি বললেন যে, আন্দোলনে মাঝে মাঝে যেমন এগুতে হয়, তেমনি পিছুতেও হয়। বক্তৃতা শেষ হলে আমি আমার বড় আপা যাদের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে মিছিলে যোগ দিয়েছিলাম সেই শম্পা ও সেবা আপার কাছে জানতে চাইলাম তাহলে কি এখন আর মিছিল হবে না? মনে হলো না তাদের কাছে কোন উত্তর আছে আর আমাকে উত্তর দেবার মত পরিস্থিতিও ছিল না। সব মেয়েরা হাউ কাউ করছিল অতএব আমি ডিপার্টমেন্টে চলে আসলাম।

ডিপার্টমেন্টেও এসে দেখলাম সবাই সব কিছু বুঝতে পারছে এরকম একটা ভাব কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করলে পরিষ্কার কোন উত্তর পাচ্ছি না। "সবই পলিটিক্স" এরকম ধরণের একটা ভাসা ভাসা উত্তর পাওয়া যাচ্ছে শুধু। সন্ধ্যায় সেই সময়কার আমার প্রেমিক অনেক সহানুভূতি নিয়ে আমাকে বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করে। সে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার থেকে দুই বছরের সিনিয়র ছাত্র তাই সে আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নিয়ে বেশী ওয়াকিফহাল ধরে নিই। তার বক্তব্য অনুযায়ী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল আন্দোলন নিয়ন্ত্রিত হয় দুইটি গ্রুপের পাওয়ারের ওপর। এই দুই গ্রুপ হল লোকাল গ্রুপ (মানে যারা সাভার এলাকার ছাত্র ক্যাডার) আর অন্যরা এ্যান্টি লোকাল গ্রুপ। সম্ভবত এই দুই গ্রুপের সংঘর্ষ এড়াতে বা যে গ্রুপটির জোর বেশী তাকে সাপোর্ট করতে ভিসি বাম সংগঠনের ছাত্র নেতাদের আলোচনায় ডেকেছিলেন এবং তাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে সীমান্তকে এখন বহিষ্কার করা যাবেনা। তিনি আরও বুঝিয়েছেন যে মেয়েটির কেইসটি আসলে স্ট্রং না, কারণ সীমান্ত আসলে তার প্রেমিক, এখন বিয়ের পরে হয়তো মেয়েটি না না করছে কিন্তু সীমান্ত যে জোর করেছে এমন প্রমাণ সে দিতে পারবে না। অতএব আন্দোলন বন্ধ কর। বাম ছাত্র নেতারা কেন কম্প্রোমাইজ করলো সেটা নিয়ে আমি পরিষ্কার হলাম না এবং প্রশ্ন করাতে উত্তর পেলাম, "ওদের তো কোন মেরুদন্ড নাই"। আর আমি বিবেচিত হলাম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনাল রাজনীতির হালচাল না বুঝে ব্যবহৃত হওয়া স্রেফ একটি গুটি হিসেবে। আমার জন্য আমার সেই সহানুভূতিশীল প্রেমিকের বরাদ্দ ছিল চুক চুক শান্তনা।

কিন্তু সত্য হল কল্পনা আন্দোলন আমাকে রাজনৈতিক কৌশল বিশেষজ্ঞ হবার প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহী করেনি। সেই আন্দোলনের ব্যর্থতা আমাকে আন্দোলনে, মিছিলে যেতেও কখনও নিরুৎসাহিত করেনি। বরং একটা নির্যাতিত মেয়ে জাস্টিস পেলো না কতিপয় ছাত্রনেতাদের আর ভাইসচ্যান্সেলরের নিজ নিজ স্ট্যাটাস বজায় রাখার কূট কৌশলে সেটাই ছিল আমার সেই সময়কার উপলব্ধি।

তুমি প্রশ্ন করেছো কেন প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতারা এবং পদপ্রাপ্ত নেত্রীরা নারী ইস্যু বিশেষ করে যৌননিপীড়ন, নারীর শরীর, মন, যৌনতা, সিদ্ধান্তের ওপর পুরুষালী আগ্রাসন সমস্যাগুলো বুঝতে পারে না বা অগ্রাধিকার দেয় না। এ প্রশ্ন আমারও। সহজভাবে এর উত্তরও দেয়া যায়- তারা আসলে সত্যিকারের প্রগতিশীল না। কিন্তু এভাবে উত্তর দেবার চাইতে আমার মনে হয় নজর দেয়া দরকার কিভাবে আন্দোলনের সহযোদ্ধারাই বার বার নারী প্রশ্ন উত্থাপন করছে এবং নেগোশিয়েট করছে সেই প্রক্রিয়াটার দিকে। উদাহরণ দিয়ে বলছি:

১৯৯৮ সালের ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনের সফলতার পর পর আমরা অনেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় পর্যায়ে যৌননিপীড়ন বিরোধী আন্দোলন সংগঠনে জড়িয়ে পড়ি। সহযোদ্ধাদের চক্রেই সবচেয়ে ক্রিটিকাল যে সমস্যায় তখন আমরা পড়েছিলাম সেটা হল সেই আন্দোলনগুলোকে পরিষ্কারভাবে যৌননিপীড়ন বিরোধী আন্দোলন হিসেবে উচ্চারণ করা। মিটিংয়ে যারা মতামত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা রাখে তাদের বেশীরভাগের বক্তব্য "যৌন" শব্দটি যুক্ত করা এখানে বাহুল্যতা, নিপীড়ন বললেই সব নিপীড়ন এ্যাড্রেস করা হয়ে যায়। যেটা আমরা মানলাম না বরং প্রশ্ন তুললাম যে ছাত্র রাজনীতি বললেই বোঝা

হয়ে যায় এখানে ছাত্রীরাও আছে, কিষাণ, মজদুর, গণ অভ্যুত্থান বললেই বোঝা হয়ে যায় তাদের স্ত্রীরাও তাদের সাথে আন্দোলনে যুক্ত আছে এই ভাষিক ও আইডিয়ালিসটিক পুরুষালী কর্তৃত্ব আমরা মানি না। 'যৌননিপীড়ন প্রতিরোধ মঞ্চ' সাংগঠনিকভাবেই এক বছরের বেশী সময় ধরে এই ইস্যুটি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চালু রেখেছিল।

এবং তুমি জেনে অবাক হবে যে এই এক তর্কের সূত্র ধরে সমাজের অসংখ্য খেটে খাওয়া লড়াকু নারীরা তখন প্রগতিশীলদের গন্ডির ভেতরে এসে তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা শেয়ার করে সব পুরনো বোঝাপড়া বা ক্ষমতাচর্চা তছনছ করে দিচ্ছিল। আমার মনে আছে পল্টনে লেখক শিবিরের অফিসে আমাদের মঞ্চে সেই সময়ে নারায়নগঞ্জ যৌনপল্লী থেকে উচ্ছেদ হওয়া যৌনকর্মীরা তাদের ওপর ঘটা দৈনন্দিন নিপীড়নের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে ভ্যাবাচ্যাকা করে ছেড়ে দিয়েছিল উপস্থিত প্রগতিশীলদের। ভ্যাবাচ্যাকা কারণ যৌনকর্মীদের প্রতি দরদ দেখানো, তাকে কমরেডের সম্মান দিয়ে হরাইজন্টাল সংহতি জানানো এতো সহজ না যত সহজ নিরাপত্তার গন্ডিতে থাকা কোন 'ইনোসেন্ট' নারী যৌননিপীড়নের শিকার হলে তার পাশে দাঁড়ানো। যেমন কঠিন হিজড়াদের নাচ দেখে তার সাথে নাচতে পারা বা সমপ্রেমীদের প্রেম/কাম স্বাভাবিক ও কাম্য বলে তার বুকের ভেতর আবেগ নিজের বুকে স্থান দেয়া।

তুমি আরেকটি বিষয়ও উত্থাপন করেছো সেটা হল প্রগতিশীলদের মধ্যে কোন্ ইস্যুটি গুরুত্বপূর্ণ সেই বাছাইটা। আমি তোমার সাথে যুক্ত করবো যে এখানে প্রগতিশীলদের ডমিন্যান্ট অংশটি এখনও ভাবে যে "সমাজতন্ত্র কায়েম হলে নারী ইস্যুরও সমাধান হয়ে যাবে"। "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ" ও "শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ" এরকম কতগুলো বড় বড় ফ্রেইম নিয়ে তারা বাগাড়ম্বর বক্তৃতা দেয়- শুনি আমি সবসময়। কিন্তু তারা এটা উপলব্ধি করে না যে সমাজতন্ত্র বলে কোন আদর্শ ছাঁচ আমাদের জন্য কোথাও অপেক্ষা করে নেই। বরং নারী ইস্যু, বেশ্যা ইস্যু, জারজ বাচ্চা ইস্যু, সমপ্রেম ইস্যু, হিজড়া ইস্যু, জাতিগত নিপীড়নের ইস্যু এই সব আপাতঃ ছোট ছোট ইস্যুগুলো ধারণ করলেই একমাত্র আমরা সমতার সমাজের দিকে এগুতে থাকবো।

আমি এবারে প্রসঙ্গ পাল্টে কথা বলতে চাই যৌন সুখ ও যৌন সহিংসতা বিষয় নিয়ে। তোমার কি মনে হয় না যৌন নিপীড়ন অপরাধটি নিয়ে কথাবার্তা চালাতে গেলে প্রতিপক্ষ লোকজন আলাপের রাস্তা পাল্টে মানুষের যৌনজ আচরন কেমন হওয়া উচিত সেটা নিয়ে একটি কর্তৃত্ব ফলানো মূলক প্রক্রিয়া শুরু করে? যৌন হয়রানি, ধর্ষণের মত যৌন নিপীড়নে প্রকৃত অপরাধী কে সেটা নির্ধারনে যৌন মতাদর্শ কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমি লক্ষ্য করেছি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ের যৌন নিপীড়ন বিরোধী আন্দোলনের সময় ও ১৯৯৮-এর ধর্ষণ বিরোধী আন্দোলন চলাকালেও, যৌন নিপীড়ককে রক্ষা করতে প্রশাসকদের পক্ষ থেকে যে ধরণের বক্তব্য পাওয়া যায় তার কয়েকটা সাধারণ ধরণ আছে।

যেমন, দুজন মানুষের সম্মতিতে করা যৌনকর্ম আর একজনের দ্বারা অন্যজনের ওপর যৌন আক্রমন এই পার্থক্যটা করতে না পারা। যেমনঃ ৯৮-এর ধর্ষণ বিরোধী আন্দোলন চলাকালীন সময়ে একটি ক্লাশরুমে, তার শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনাকালে কলা অনুষদের কোন এক শিক্ষক উত্থাপন করেন, *"চিনি তো মিষ্টিই, সেটা জোর করে খাওয়ালেও মিষ্টিই লাগবে"*। তার উদ্দেশ্য ছিল ধর্ষণের মত একটা সহিংসতাকে লঘু করে উপস্থাপন করা। ধর্ষণকে ধর্ষিত উপভোগ করে থাকে এরকম মতাদর্শ কিন্তু সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়, বিশ্বব্যাপী। দিনে পর দিন ধর্ষিত হতে হতে ধর্ষণকেই যৌন আচরণের স্বাভাবিক রূপ বলে মেনে নেয়ার বাস্তবতা সমাজে বিরাজ করে সেটাও কিন্তু সত্য। এমন ঘটনাও মানব সমাজে ঘটে থাকে যে ধর্ষণকারীর সাথে ধর্ষিতা'র প্রেম হয়ে, বিয়ে হয়, বাচ্চা হয়, সংসার হয়। কিন্তু প্রত্যেকটি ঘটনা ও মানুষকে স্বতন্ত্রভাবেই বিবেচনা করতে হবে। বিশেষ করে নারী যখন নিজে বিষয়টিকে আগ্রাসন বলে অভিযোগ করছে। কিন্তু ধর্ষণ ও যৌনসুখকে এক করে দেখার অদ্ভুত এই মতাদর্শে বিশ্বাসী লোকজনের কাছে নারীর ওপর যৌন আগ্রাসন কিছুতেই যেন অপরাধের মর্যাদা পায় না। নিজেরা ধর্ষণকারী/ যৌননিপীড়নকারী না হয়েও কি যেন এক আত্মীয়তা বোধ করে নিপীড়নকারীর সাথে। সেই আত্মীয়তার প্রমাণ দিতে তারা সবচেয়ে বেশী টেনে আনে প্রকৃতিকে। মানুষ যে প্রতিনিয়ত সমাজ-সংস্কৃতি নির্মাণ করে, রূপান্তর করে সেটা তখন আর তাদের মনেই থাকেনা। তাদের প্রকৃতি হয় স্থবির, নয় অপরিবর্তনশীল যেটা মনে করে পুরুষ মানে কামের মত একটি রিপুর কাছে সম্পূর্ণ পরাজিত, পশুরও অধম এক জীব আর নারী শুধুমাত্র পুরুষের যৌন উত্তেজনা আর সুখ সরবরাহের বা সন্তান ধারনের একটা শরীর মাত্র। এসব আলাপচারিতা, এই মতাদর্শ সমকাম/সমপ্রেমকেও কিন্তু সুস্থ/স্বাভাবিক মানবিক আচরণ বলে বিবেচনা করে না। কী বলো তুমি?

কিন্তু ধর্ষণ ও যৌনসুখকে এক করে দেখার অদ্ভুত এই মতাদর্শে বিশ্বাসী লোকজনের কাছে নারীর ওপর যৌন আগ্রাসন কিছুতেই যেন অপরাধের মর্যাদা পায় না। নিজেরা ধর্ষণকারী/ যৌননিপীড়নকারী না হয়েও কি যেন এক আত্মীয়তা বোধ করে নিপীড়নকারীর সাথে।

শামীমাঃ তোমার প্রশ্নের চাইতে তোমার উপলব্ধিতে এই বাংলাদেশে, এই সময়ে সক্রিয় থাকা সমাজে যৌন মতাদর্শটাই প্রথমে নোটিস করতে চাই। যেহেতু আমাদের সময় একই, আমাদের উপলব্ধি সঙ্গত কারনেই কাছাকাছি বা একটা ব্রিজ আছে উপলব্ধি এক্সচেইঞ্জের। কিন্তু আমি প্রশ্নটা এইভাবে তুলতে চাই, নারীর সেক্সুয়াল প্লেজারের স্বীকৃতি নাই কেন? উচ্চকিত স্বরে আলাপ চলে না কেন? সাব-টেক্সট কেন মূলধারায় "নেইমলেস ফেইসলেস"?

সোসাইটির মেইন টেক্সট হৈতেসে, এইটা একটা বন্ধ টানেল। এইখানে সেক্সে নারী বিছানায় শোয় খালি, শোয়ায় না। ও খালি বিলায় দেয়, পুরুষের শরীরের তলায় থাইকা, ওর অরগাজম হয় না বা ও বোঝে না। সেক্সে নারী শুধু রিসিভার। অথচ, সাব টেক্সট হৈল, এই সোসাইটিরই- আমার পুরুষ বন্ধুরা, বেশিরভাগই তাদের প্রেমিকার সাথে সেক্সে প্রেমিকার এনজয়মেন্টকে দেখছে, তার উদ্দামতা, সেক্স উপভোগ করা দেখছে, সক্রিয় ভূমিকায় থাকা অভিজ্ঞতায় নিসে। আমি বেশিরভাগকেই বলতে শুনসি, প্রথম দিককার সেক্স এক্সপেরিয়েন্সে নারী পার্টনার নার্ভাসনেস ওভারকাম করতে কতটা উদ্যোগি ভূমিকা পালন করসে! কিন্তু এইসব সাব টেক্সট। এইসব এই ভূগোলকীয় সীমারেখার বাসিন্দা পুরুষদের অভিজ্ঞতায় আছে। কিন্তু নারীর প্লেজারকে স্বীকৃতি দিয়া উচ্চারণ করাই যেন যাবতীয় সমস্যা। তাই সোসাইটির মাস্টাররা নারীর যৌনতা উদযাপনকে মেইন টেক্সটে আনে না বা রাখে নাই। এইরকম মেইন টেক্সটের মুখে সাবটেক্সটের প্রশ্ন বলা যায় ১৯৯৮ সালের ধর্ষন বিরোধী আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রথম মিছিলে, তখনকার ভারপ্রাপ্ত ভিসি রেজিস্টার বিল্ডিংয়ের নিচে মিছিল নিয়ে আসা মেয়েদের বিশাল গ্যাদারিং এবং পাশে জমে থাকা ধর্ষনের অভিযোগে অভিযুক্ত মানিকসহ ছাত্রলীগের নেতা কর্মীদের ঘাপটিমারা অবস্থানকে সামনে রেখে প্রশ্ন করলেন, "কে

ধর্ষিত হয়েছে? কে?" সোসাইটির মেইন টেক্সটের শিক্ষায় শিক্ষিত এবং যাপিত জীবনধারী ভিসি আমাদের বিব্রত এবং অপমান করে থামায় দেয়ার জন্যই ওইভাবে প্রশ্ন করসিল। এবং আমরা সামনে থাকা বিভিন্ন কর্নার থেকে কয়েকজন এক সাথে চিৎকার করে বলসিলাম, *"আমরা সবাই ধর্ষিত"*। এইটা আমি বলবো, আমাদের ওই উচ্চারণে ওই দিনই আমরা পরিষ্কার করে দিয়েছিলাম আমাদের অ্যাটিটিউড। সেই অ্যাটিটিউড হৈল, কে ধর্ষিতা বলে ভিসির প্রশ্ন সামাজিক এই মেইন টেক্সট, যে, আমাদের 'শরমে মুখ বন্ধ করে ফেলার' উদ্যোগ নিসিল; আমাদের সেই উদ্যোগকে ভোঁতা করা জবাবে দুইটা বিষয় ছিল ১. ধর্ষণে লজ্জা পাওয়ার কিছু নাই, কারণ ওইটা অপরাধ। ২. আমি কে বিষয় না, অপরাধীর বিচার কর।

প্রথম দিনের প্রথম মিছিলে ভিসির এরকম একটা জবাব খাওয়া বিশেষ করে মেয়েদের কাছ থেকে নির্ধারণ করে দিসিল যে প্রচলিত ব্রিটিশ প্রণীত অপরাধ আইন বা সিআরপিসি (কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিউর) বাদ দিয়ে স্বায়ত্ব শাসিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নিজস্ব আইনে ধর্ষক ছাত্র মানিকসহ অন্যদের বিচার প্রক্রিয়ায় যেতে হবে।

এই অ্যাটিটিউডটাও সাব টেক্সট।

সাব-টেক্সট বলতে আমি বুঝাচ্ছি, যে বিষয়টার জোরালো উপস্থিতি এবং ক্রিয়া বর্তমান সমাজে কার্যকর আছে এবং সমাজ সেটাকে অবস্তুগত উপকরণের মাধ্যমে দমিয়ে রাখে, যেন সরাসরি, স্বাভাবিক আলাপ-পরিসরে উচ্চারিত না। অর্থাৎ ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটায়ে জোর করে ঘটমান বাস্তবতাকে অস্বীকার করা, মানে ডিনাই করা।

এই সমাজে একটা মেয়ে বিয়ে না করে একটা ছেলের সাথে দিন-রাত যাপন করে। বিয়ে করার পরও আবার অন্য আরেক পুরুষের সাথে সেক্স করসে। এখন মেইন টেক্সট বলতেসে, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক অবৈধ। খারাপ। এই ধরনের সম্পর্ক সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ বলে টেলিভিশনে প্রচারিত হয়, প্রিন্ট এবং অনলাইন সংবাদ পত্রে পরিবেশিত হয়। এমন যেন এই দেশে সাবেক ও বর্তমান ক্ষমতাবানরা অবৈধ সম্পর্ক জীবনেও যাপন করেন নাই, যেহেতু তারা ভোট পেয়ে বা ভোট পাওয়াঅলাদের দ্বারা ক্ষমতায়িত। মানে যেহেতু তারা রোল মডেল। মানে যেহেতু তারা দৃশ্যমান ক্ষমতার ফ্রেমে। আর যখন তাদের অবৈধ সম্পর্কের খবর ফাঁস হয়ে পড়ে, তখন আমরা তাদের অপরাধী হিসাবে দেখতে পাই না, দেখতে পাই ক্ষমতাধর হিসাবে, যে, ক্যামন করে ক্ষমতার ব্যবহার করে অপরাধী থেকে "সাদা মনের মানুষ" হয়ে যান। তারাই নীতি নির্ধারক। মেইন টেক্সট রচয়িতা। ফলে সমাজে মনোগ্যামাসের ভূত ছাড়াও যে পলিগ্যামাস স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে জোরালো অবস্থান নিয়ে আছে, সেইটা অস্বচ্ছ রূপে অবস্থান করে।

এই দৃষ্টিভঙ্গীতে ওড়না না পরা মেয়ে ছেলেদের "খারাপ কাজে" ইনভাইট করে।

এই দৃষ্টিভঙ্গীতে রাস্তায় রাতে একা হাঁটা বা রেস্টুরেন্টে যাওয়া মেয়ে মানেই যৌনকর্মী।

এই দৃষ্টিভঙ্গীতে বেশি ছেলে বন্ধু থাকা মানে ফ্রি সেক্স করে বেড়ানো মেয়ে।

এই দৃষ্টিভঙ্গীতে মেয়ে আগে প্রেম প্রপোজ করলে, সে সহজলভ্য। মানে তার সাথে সেক্স করা সহজ।

এই দৃষ্টিভঙ্গীতে রাস্তায় চলন্ত বা বসে বা খাড়ায়া থাকা পুরুষের পুং অঙ্গ জাগ্রত ও প্রসারিত হওয়ার জন্যও নারী দায়ী, কারণ সে এমনভাবে শাড়ি পড়সে বা জিন্স আর টপস পড়ছে বা সালোয়ার-কামিজের সাথের ওড়নাটা এমনভাবে রাখসে যে ওইটা দেখেই তড়াক করে পুং অঙ্গ জাইগা উঠলো যে পুরুষের কোন দায় নাই। সব নারীর দোষ।

মানে নারী একটা সেক্সচুয়াল প্রাণী যে খালি পুরুষের কাম দণ্ডকে জাগ্রত করার ভূমিকাই পালন করে, ধর্মগ্রন্থে ইভ বা হাওয়ার যেরকম রিপ্রেজেন্টেশন। নারীর জন্যই পুরুষ রাগ করে স্ত্রী রূপক নারীকে পিটায়, গালাগালি করে। নারীর জন্যই স্বামী পুরুষ অন্য নারীর সঙ্গে প্রেম করে, কারণ স্ত্রী নারী তাকে আটকায়া রাখতে ব্যর্থ। নারীর জন্যই পুরুষ নারীকে ধর্ষণ করে, বাসে, মাইক্রোবাসে, নৌকায়, ঝোপে, বাথরুমের পিছনে, ঘরে, পাহাড়ে-সবখানে; কারণ নারী শরীরের কোন না কোন অংশ দ্বারা বা ওই অংশের উপস্থিতি ও অবস্থান তার শরীরে আছে বলেই পুরুষ ধর্ষণে উদ্বুদ্ধ হৈসে।

সেক্সুয়াল প্লেজার বা যৌনতার আনন্দ তো শুধু বড়লোক, সামর্থ্যবান বা লিবারেটেরিয়ান নারীর ইস্যু না। এইটা আসলে ইস্যু না, স্বাভাবিক প্রবৃত্তির কথা। সহজাত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যেইটা গরীব নারী, মধ্যবিত্ত, ধনী নারী, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে জীবন ঝুঁকি নিয়ে অবৈধভাবে সীমানা পাড়ি দেয়া নতুন জীবন খোঁজা নারী, সবাই-ই অভিজ্ঞতা করেন। এইটা সহজাত প্রবৃত্তি।

হয়তো বিষয়টা ছোট, হয়তো কিছু মানুষ বলবেন, কিছু অনুভূতি আছে উচ্চারণ না করে মনে রাখাই আরাম, হয়তো কেউ বলবেন, সেক্সুয়াল প্লেজারের কথা বলা নারীরা তো বেশ্যা। কিন্তু সত্যি বলি, এই ছোট্ট বিষয়টাকে পাবলিকলি নোটিস করার ভিত্রে কোথায় যেন "নারী পুরুষের অর্ধাঙ্গী" বোধের ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ার ধাক্কা আছে। সমাজ এবং সমাজের পুং গোষ্ঠী নারীকে যৌনতায় পোট্রে করে "পুরুষ স্পর্শ করবে/আর নারী স্পর্শে নিজের যৌনতা মেলে ধরবে"। মানে রিসিভার, নারী অ্যাক্টিভ রিসিভার আর পুরুষ অ্যাক্টিভ প্রোভাইডার। যৌনতা যে একটা পারস্পরিক ব্যাপার সক্রিয়তার দিক থেকে, এইটা সরাসরি কখনোই স্বীকার করে না সমাজের ফ্রন্ট পেইজ, ব্যাক পেইজ। অস্বীকার করা, এই ডিনায়ালের মূল কারণ শাসন। ছোট করে রাখলেই নিয়ন্ত্রণ করা সহজ। নারীকে আসলে পূর্নাঙ্গ সত্ত্বা না ভাবাটাই প্রচলন, সে টাকা উপার্জন করুক, তাতে কী! ওর উপার্জিত সম্পত্তির তো আইনগত পরিনতি ভিত্তিক নির্দেশনা নাই।

পুরুষ যেহেতু তার যৌন রস যোনীতে ঢালে আর নারী তা ধারণ করে বাচ্চা ফুটায় আর বাচ্চা যেহেতু তার অস্তিত্বের ধারাবাহিকতার স্বীকৃতি হিসাবে সমাদৃত, সেই সমাদর পেতে নারীকে পুরুষের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হবে। এই ন্যারেশনে সবসময়ই সাইলেন্ট থাকে যে, পুরুষকেও একই সমাদর ও ক্ষমতার দাপটের জন্য নারী ছাড়া বিকল্প নাই, জৈবিক প্রক্রিয়ায়। নারীর যৌনসুখকে স্বাভাবিক আলাপ আলোচনায় থাকলে নারীর স্বাভাবিক এবং পূর্নতার স্বত্ত্বা প্রকাশ্য হয়ে ওঠে আর এই প্রকাশ্যই আতঙ্ক সমাজের মেইন টেক্সটের জন্য। এই আতঙ্ক হৈল ক্ষমতাধরদের ছড়ি ঘুরানোর জন্য প্রয়োজনীয় (রেড মার্ক/আবশ্যকীয়) দুর্বল ও ক্ষমতাকাঙ্খী গোষ্ঠী হারানোর আতঙ্ক।এই আতঙ্কের সাথে এই সমাজের সামাজিক ডু এবং ডোন্ট ভুতে বেড়ে ওঠা পুরুষের পুংদণ্ড খাড়া হওয়া না হওয়ার গভীর, চুড়ান্ত সম্পর্কও আছে।

নাসরিন: ধন্যবাদ তোমাকে। আমাদের আলাপ চলবে।

[এই আলাপটি *ঠোঁটকাটা* নারীবাদী লেখক দল অগাস্ট, ২০১৫ এ প্রথম দুই পর্বে প্রকাশ করে। এখানে তার কিছুটা সংক্ষেপিত রূপ প্রকাশিত হলো। তাদের ওয়েব ঠিকানা: www.thotkata.net]

নাসরিন সিরাজ এ্যানী: নৃবিজ্ঞানী, গবেষক ও লেখক।
ইমেইল: nasrinsiraj@yahoo.com

শামীমা বিনতে রহমান: সাংবাদিক ***ও গল্পকার।***
ইমেইল: sbinte@gmail.com